আল্লাহর দিকে আহ্বান ও দায়ীর গুণাবলি

[বাংলা]

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة

[اللغة البنغالية]

লেখক : কামালুদ্দিন মোল্লা

تأليف : كمال الدين ملا

সম্পাদনা : ইকবাল হোসাইন মাসুম

مراجعة : إقبال حسن معصوم

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

islamhouse.com

আলাহর দিকে আহবান ও দায়ীর গুণাবলি

আলাহ জ্বিন–ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে, এবং তাঁর নাম ও গুণাবলিসহ তাকে জানার জন্য।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) سورة الذاريات

'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) سورة البقرة

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।'[২]

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢) سورة الطلاق

'তিনি আলাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আলাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আলাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।'[৩]

আলাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন, যেন তাঁর ইবাদত করা হয়, যথাযথ ভাবে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা হয়। কারণ ইবাদত হল: আলাহর আদেশ-নিষেধসমূহকে সম্মান করার সাথে সাথে তাঁর একত্ববাদকে স্বীকার করা, এবং তাঁর আনুগত্য করা। আকাশ-যমীন ও এ দুয়ের মাঝে সবকিছুর সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করে তিনি বলেন, এসব সৃষ্টি করেছেন, যাতে সৃষ্টিকুল ধারণা পায় যে, আলাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে- সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের অধীন।

এর মাধ্যমে তা জানা গেল সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি ও অস্তিত্বদানের রহস্য কি, আর তা হচ্ছে, সৃষ্টিকুল আলাহর নাম ও গুণাবলিসহ তাঁর পরিচয় জানবে, এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত মর্মে ধারণা লাভ করবে। যেমনি ভাবে এদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বদানের হিকমত হল, তারা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর মহত্ব স্বীকার করবে, এবং তাঁর বড়ত্বের কারণে তারা তাঁর আনুগত্য করবে।

ইবাদত হচ্ছে: আলাহর আনুগত্যে নিজেকে নিবেদন করা, এবং তাঁর কাছে অবনত হওয়া। আদেশ–নিষেধ বিষয়ক দায়িত্বগুলো সম্পাদন করা। মহান আলাহ মুকালাফদের (শরীয়তের অনুগামী) যা হুকুম করেছেন তা পালন করাকেও ইবাদত বলা হয়, করণ এগুলো বান্দাকে আলাহর আনুগত্য এবং তাঁর কাছে নতশির হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

যখন মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে ইবাদতের স্বরূপ ও তার মূল তত্ত্বকথা বিস্তারিতভাবে আয়ত্বকরা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে ওই বিবেকের মাধ্যমেই আহকাম তথা শরয়ী বিধি-নিষেধ সবিস্তারে জানাও অসম্ভব। তাই আলাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যে উদ্দেশ্যে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করলেন। অবতীর্ণ করলেন অগণিত কিতাব। যাতে তারা জেনে শুনে ইবাদত করে, এবং জেনে শুনে নিষিদ্ধ কাজসমূহ ত্যাগ করে। সে বিচারে রাসূলগন হলেন মাখলুকের পথ প্রদর্শক এবং হেদায়েতের ইমাম। জ্বিন-ইনসান সকলকে তারা আলাহর বন্দেগি এবং ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন। আলাহ তাদের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদের সম্মানিত করেছেন। তাদের প্রেরণ করে নিজ বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এবং তাদের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন সঠিক ও সরল পথ। যাতে বান্দাদের নিজেদের ভালো–মন্দ বিষয়ে পরিষ্কার জানা থাকে। এবং বলতে না পারে যে আলাহ আমাদের কাছে কী চেয়েছেন তা আমরা জানতে পারিনি। আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী আসেনি। আলাহ এরূপ ওজর-আপত্তির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন রাসূলদের প্রেরণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে ।

[১] যারিয়াত, ৫৬।
[২] রাকারাহ, ২১।
[৩] সূরা ত্বালাক্ব, ১২।

যেমন আলাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (٣٦) سورة النحل

'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আলাহর বন্দেগি কর, এবং তাগুতকে বর্জন কর।'[৪]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥) سورة الأنبياء

'আমি তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করেনি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।'[৫]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (٢٥) سورة الحديد

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছি কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[৬]

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (٢١٣) سورة البقرة

'মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; অতঃপর আলাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।'[৭]

অতঃএব আলাহ বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, মানুষের মাঝে হক এবং ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করার জন্য। এবং শরীয়ত ও আকীদার যে সব বিষয়ে তারা বিরোধ করেছিল তা বিশেষণ করার জন্য। কারণ আলাহর বাণী كان الناس أمة واحدة 'মানব জাতি ছিল একটি উম্মাহ–জাতি, এর অর্থ হলো তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, হক বিষয়ে তারা কোন মতবিরোধ করত না; আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে আলাহর রাসূল নূহ আলাইহিস সালামের নবুয়্যত কাল পর্যন্ত। তারা ছিল হিদায়েতের উপর, সাহাবি আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস, রাদিয়ালাহ আনহু বলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মনীষিগণের মত এটাই। অতঃপর নূহ আলাইহিস সালামের কওমের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো, এবং বিরোধ করলো তাদের উপর অবশ্যই পালনীয় আলাহর হক বিষয়ে। আর তারা যখন শিরক ও ঝগড়া–বিবাদে জড়ালো তখন আলাহ তাআলা নূহ এবং পরবর্তী রাসূলদের প্রেরণ করলেন।

যেমন আলাহ বলেছেনঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (١٦٣) سورة النساء

'নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি যেরূপ প্রত্যাদেশ করেছিলাম নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি।'[৮]

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) سورة النحل

'আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।'[৯]

সুতরাং আলাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, মানুষ যে সব বিষয়ে মতভেদ করেছিল সে বিষয়ে আলাহর হুকুম বর্ণনা করার জন্যে, মানুষের অজানা বিষয়ে আলাহর বিধানের বর্ণনা দেয়ার জন্যে, তাদেরকে শরীয়ত আঁকড়ে ধরা ও তার

[৪] সূলা নাহল ৩৬।
সূরা আম্বিয়া, ২৫।
[৬] সূরা হাদীদ, ২৫।
[৭] সূরা বাক্বারা, ২২৫।
[৮] সূরা নিসা, ১৬৩।
[৯] সূরা নাহাল, ৬৪।

নির্ধারিত সীমায় অবস্থানের আদেশ দান এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্যে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বারণ করার জন্যে। আলাহ তাআলা রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত করেছেন রাসূলদের ইমাম, আমাদের নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুলাহর মাধ্যমে। তিনিসহ সকল নবীদের উপর আলহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি আলাহ প্রদত্ত্ব রিসালত পৌঁছিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, আলাহর জন্যে যথার্থভাবে লড়েছেন, গোপন ও প্রকাশ্যে আলাহর প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, এবং আলাহর খাতিরে কঠিন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন তাঁর পূর্বে আগমনকারী নবী-রাসূলগণ –আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম। ধৈর্য ধারণ করেছেন যেমনিভাবে তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং রিসালত পৌঁছানোর দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন যেমনি করে তারা এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে তিনি নির্যাতানের স্বীকার হয়েছেন অনেক বেশি এবং সহ্যও করেছেন অনেক বেশি। রিসালতের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। তাঁর ও তাদের সকলের উপর আলাহর দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক। তেইশ বছর আলাহর রিসালাত পৌঁছিয়েছেন এবং আলাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁর আহকাম প্রসার করেছেন। মক্কায় তের বছর, প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে। হক প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেছেন এবং নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, দাওয়াতে এবং মানুষ কর্তৃক অত্যাচারে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। অথচ তারা তাঁর সততা এবং আমানতদারী বিষয়ে জানতো। তারা জানতো তাঁর গুণী হওয়া, তাঁর বংশ, তাঁর মর্যাদা। তবে নেতাদের কামনা, হিংসা, বিদ্বেষ আর সাধারণের মূর্খতা এবং অন্ধানুকরণ ছিল এর কারণ। তাই নেতারা অস্বীকার করলো, অহংকার করলো, হিংসা করলো এবং সাধারণে অন্ধবিশ্বাস করল, এবং নেতাদের অনুসরণ করল, রাসূলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল, এ কারণে তিনি অনেক কঠিন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তাঁর উপর দরূদও সালাম বর্ষিত হোক। আমাদেরকে কুরআন নির্দেশন করছে যে নেতারা জেনে শুনে সত্যের বিরোধিতা করেছিল। আলাহ তাআলা বলেছেন–

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) سورة الأنعام

‘আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু তারা তো তোমাকে অস্বীকার করে না, বরং যালিমরা আলাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।’[১০]

আলাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে মিথ্যা জ্ঞান করতোনা, তাদের অন্তরে তাঁর সততা ও আমানতদারী সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারনা ছিল বরং তারা তাঁকে সম্বোধনই করতো ‘আল আমীন’ বলে; এবং এটি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই। তবে তারা সত্যকে অস্বীকার করল, বিদ্বেষ ও অবাধ্যতা বশত। কিন্তু রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এ সবের কোন পরওয়া করেননি, বরং ধৈর্য ধারণ করেছেন ও সওয়াবের আশা করেছেন। এবং আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন অবিচলতার সাথে। এ ভাবেই আলাহর দিকে আহবানকারী, নির্যাতনে ধৈর্যশীল, দাওয়াতে পরিশ্রমী, সাধারণের যন্ত্রনা অপসারণকারী, কষ্ট সহ্যকারী, এবং যথাসাধ্য তাদের থেকে সংঘটিত অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ মার্জনাকারী হয়ে থেকেছেন। এক পর্যায়ে এটা খুব মারাত্মক আকার ধারণ করল। তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক এ সময়ে আলাহ তাঁকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন, তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসলেন আর মদীনা হয়ে গেল ইসলামের প্রথম রাজধানী। মদীনায় আল-াহর দ্বীনের বিজয় হলো। এবং সেখানে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত সূচিত হল। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম হকের প্রচার ও প্রসারতার ধারা চালিয়ে গেলেন নির্ভীক ভাবে। তরবারির মাধ্যমে জিহাদ শুরু করলেন। মানুষকে কল্যাণ ও হিদায়েতের দিকে আহবানের জন্য দূত পাঠাতে লাগলেন দিকে দিকে। তারা মানুষকে তাদের নবী মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের দাওয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করতে থাকলেন অবিরাম। সাথীদের যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়েছেন এবং নিজেও বিখ্যাত যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহন করেছিলেন। এক পর্যায়ে আলাহ তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে বিজয় দান করলেন, দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলেন, তাঁর উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলেন। এ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ এবং যথাযথ ভাবে পৌঁছানোর পর তাঁকে মৃত্যু দান করা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে এ আমানত সাহাবায়ে কেরাম বহন করলেন এবং তাঁর পথ অনুসরণ করলেন। আলাহর দিকে আহবান করলেন এবং তারা হকের দায়ী, আলাহর পথে জিহাদকারী হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন। আলাহর স্বার্থে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করতেন না। তারা আলাহর রিসালাতকে পৌঁছাতেন, তাঁকে ভয় করতেন অন্য কাউকে নয়। ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্বময় বিজয়ী মুজাহিদ, সরল পথের দায়ী, কার্যকর সংস্কারক হিসেবে। তারা আলাহর দ্বীন প্রচার করতেন, তাঁর শরীয়ত মানুষকে শিক্ষা দিতেন, এবং তারা মানুষের জন্যে আকীদাহ বিষয় ব্যাখ্যা করতেন যা নিয়ে

[১০] সূরা আনআম, ৩৩।

প্রেরিত হয়েছিল রাসূলগন। আকীদাহর মূল হলোঃ আন্তরিকভাবে একমাত্র আলাহর ইবাদত করা, এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু–গাছ, পাথর, মূর্তি ইত্যাদির ইবাদত পরিত্যাগ করা। অতএব ডাকা যাবে না আলাহকে ছাড়া, সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না আলাহ ছাড়া কারো কাছে, বিচার–ফায়সালা মানা যাবে না আলাহর শরীয়ত ছাড়া, নামায আদায় করা যাবে না তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যতীত, মান্নত করা যাবে না তাঁর নামে ছাড়া, এক কথায় সকল ইবাদত তাঁর জন্য হওয়া।

এবং তারা মানুষের কল্যাণে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইবাদত আলাহর হক্ব, এবং তাদের সামনে এ বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলো পাঠ করেছেন। যেমন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (٢١) سورة البقرة

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর'[১১]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (٢٣) سورة الإسراء

'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না'[১২]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) سورة الفاتحة

'আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'[১৩]

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) سورة الجن

'সুতরাং আলাহর সাথে তোমরা অন্য কাইকেও ডেকোনা'[১৪]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) سورة الأنعام

'তুমি বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আলাহর জন্যে, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।'[১৫]

তারা এর উপর ইস্পাত কঠিন ধৈর্য ধারণ করেছেন, এবং আলাহর পথে মহা সংগ্রাম করেছেন। আলাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট তারাও আলাহর উপর সন্তুষ্ট। তাদের অনুসরণ করেছেন আরব– অনারবের তাবেঈন তাবে তাবেঈন– হিদায়েতের ইমামগণ। এবং দাওয়াত ইলালাহর পথে তারা চলেছেন, বহন করেছেন দাওয়াতের বোঝা, আমানত আদায় করেছেন, আলাহর পথে জিহাদ করেছেন ধৈর্য, সততা, আন্তরিকতার সাথে। ধর্মত্যাগী অথচ সে আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত জিযয়া আদায় করে না তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কারণ লড়াইই ছিল এর উপযুক্ত পাওনা। সুতরাং রাসূলের পর তারাই দাওয়াতের বাহক, পথ প্রদর্শনের ইমাম। এমনিভাবে সাহাবাদের পরবর্তী যারা এসেছেন তারাও এ পথ অনুসরণ করেছেন। এ পথে ধৈর্য ধারন করেছেন। আলাহর দ্বীন ব্যাপ্তি পেয়েছে, সাহাবা এবং পর্যায়ক্রমে তাদের পরবর্তী ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ঈমানদারদের হাতে আলাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ দাওয়াতী মিছিলে আরব– অনারব, আরব উপদ্বীপ এবং এর বাহিরে সমগ্র বিশ্ব হতে অংশ গ্রহণ করেছেন অনেক ধর্মপিপাষু মানুষ। যার ভাগ্য আলাহ সুপ্রসন্ন রেখেছেন, এবং যারা ইসলাম কবুল করেছে, দাওয়াত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে, এর জন্যে ধৈর্য ধারণ করেছে, যাদের জন্য ধৈর্য, ঈমান, আলাহর পথে লড়াইয়ের ফল স্বরূপ এসেছিল সৌভাগ্য, নেতৃত্ব, দ্বীনের ইমামত। তাদের ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলদের প্রসঙ্গে আগত আলাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤) سورة السجدة

'আর আমি তাদের মধ্য হতে কিছু লোককে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। তারা ধৈর্যধারণ করতো আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।'[১৬]

কোরআনের এ অমোঘ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে রাসূলের সাহাবা ও তাদের অনুগামীদের মাঝে। তারা ইমাম, হেদায়েতের পথ প্রদর্শক, হক্বের প্রতি আহবানকারী, ও অনুকরণীয় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাদের ইস্পাত

[১১] সূরা বাকারাহ ,২১।
[১২] সূরা ইসরা, ২৩
[১৩] সূরা ফাতিহা, ০৫।
[১৪] সূরা জ্বীন, ১৮।
[১৫] সূরা আনআম, ১৬২-১৬৩।
[১৬] সূরা সাজদাহ, ২৪।

কঠিন ধৈর্য ও দৃঢ় ঈমান তাদেরকে এ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। কারণ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে দ্বীনের ইমামত ও নেতৃত্ব লাভ হয়। সুতরাং নবী সহচরবৃন্দ ও অদ্যাবধি যারা সর্বকাজে তাদের অনুসরণ করেছে তারাই মূলত: সত্যের পথপ্রদর্শক, ও ন্যায়ের পথে নেতৃত্বদানকারী।

উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট পরিস্কার হয়ে গেল যে, আলাহর দিকে আহবান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উম্মতের জন্যে সর্বকালে সর্বস্থানে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

দাওয়াত বিষয়ক বক্ষমান নিবন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পাবে।

১. দাওয়াতের হুকুম ও ফযিলত
২. আদায় পদ্ধতি
৩. দাওয়াতী বিষয়বস্তু
৪. দাওয়াত কর্মীর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

প্রথম বিষয়: আলাহর দিকে আহবানের হুকুম ও ফযিলত।

দাওয়াতের হুকুমঃ

দাওয়াত ইলালাহ তথা আলাহর পথে আহ্বান অন্যান্য ফরযের ন্যায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলীল এটির প্রমাণ বহন করে। যেমন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) سورة آل عمران

'আর যেন তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আরা তারাই সফলকাম।'[১৭]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) سورة النحل

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।'[১৮]

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) سورة القصص

'তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[১৯]

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (١٠٨) سورة يوسف

'তুমি বল: এটাই আমার পথ, আলাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং যে আমার অনুসারী...'[২০]

উলেখিত আয়াতগুলোতে আমরা দেখলাম আলাহ তাআলা বলছেন, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের অনুসারীগণই দায়ী ইলালাহ এবং তারাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। আর রাসূলের অনুসরণ করা, তাঁর মতাদর্শের উপর চলা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। আলাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١) سورة الأحزاب

'তোমাদের মধ্যে যারা আলাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আলাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে আলাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[২১]

প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলেছেন, দায়ীগণ যে অঞ্চলে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন সে অঞ্চল অনুপাতে দাওয়াত ইলালাহ ফরযে কিফায়া; কারণ প্রতিটি অঞ্চলে দাওয়াত ও দাওয়াতের নানাবিধ তৎপরতা বিদ্যমান থাকা জরুরি। এ দাওয়াত ফরযে কিফায়া। যদি কোন অঞ্চলে প্রয়োজনীয়তা অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ লোক দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে সে অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যদের উপর থেকে আবশ্যকীয়তা রহিত হয়ে যাবে। তাদের ক্ষেত্রে এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও একটি অতি উন্নত নেক আমল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি সে অঞ্চলে দাওয়াতী কোন তৎপরতাই না থাকে, কেউই এ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে,

[১৭] সূরা আলে ইমরান, ১০৪।
[১৮] সূরা নাহল:১২৫
[১৯] সূরা কাসাস, ৮৭।
[২০] সূরা ইউছুফ, ১০৮।
[২১] সূরা আহযাব, ২১।

সকলেই অপরাধী বলে গণ্য হবে। সাথে সাথে দাওয়াতীকর্ম সকলের উপরই ফরয হিসেবে বর্তাবে, সকলকেই সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াতকর্মের সাথে নিজেকে জড়াতে হবে। হ্যাঁ সামগ্রিকতার বিচারে পুরো দেশের জন্যে একটি জামাআত থাকতে হবে; থাকা ওয়াজিব, যারা সর্বত্র আলাহর বাণী পৌঁছে দেবে, সাধ্যমত আলাহর আদেশ–নিষেধ সম্বন্ধে লোকদের অবহিত করবে। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও রাষ্ট্র প্রধানের কাছে দায়ী প্রেরণ করেছেন, পত্র দিয়েছেন, এবং তাদেরকে আলাহর দিকে আহবান করেছেন।

বর্তমান যুগে আলাহ তাআলা দাওয়াতী কাজকে আমাদের জন্য বিভিন্নভাবে সহজ করে দিয়েছেন, যা আমাদের পূর্বেকার লোকদের জন্য ছিলনা। আজকের যুগে ইসলাম প্রচার, দাওয়াতকর্ম পরিচালনা ও মানুষের কাছে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন অনেক দিক দিয়েই সহজ। বিশেষকরে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে দাওয়াত ও প্রচার কর্ম আরোও সহজ হয়ে গিয়েছে। একাজে বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রসহ নানা মাধ্যমের সাহায্যে অতি সহজে কর্মে অগ্রগতী সাধন করা যা।

অতএব জ্ঞানবান, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ ও নায়েবে রাসূলদের উপর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করা, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আলাহর বার্তা তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ মহৎ কাজে জড়িত হলে চারিদিক থেকে অসহযোগিতা, বাঁধা ও ব্যঙ্গ–বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হবে তখন এসব আমলে না নিয়ে নির্ভয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়া। এ দায়িত্ব পালনকালে বড়–ছোট ধনী–গরীবে কোন ভেদাভেদ ও তারতম্য সৃষ্টি না করা। বরং আলাহর হুকুম যেভাবে আলাহ অবর্তীণ করেছেন ঠিক সেভাবে আলাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া।

অবস্থার আলোকে কখনো কখনো এ দাওয়াতী কাজ 'ফরযে আইন' হয়ে থাকে। যেমন আপনি যদি এমন কোন স্থানে অবস্থান করেন যেখানে আপনি ছাড়া এ দায়িত্ব পালনের অন্য কেউ নেই, যে সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে তখন এটি আপনার জন্যে ফরযে আইন হবে। আবার অবস্থাভেদে কখনো কখনো ফরযে কেফায়া, ইত:পূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং যখন আপনি ব্যতীত এ দায়িত্ব পালনের আর কেউ থাকবে না তখন এতে আত্মনিয়োগ করা আপনার জন্যে ফরযে আইন। আর অন্য কেউ থাকলে হবে সুন্নত এবং একটি নেক কাজে অংশগ্রহণ।

দাওয়াত 'ফরযে কিফায়া' এর দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা যায়।

আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... (١٠٤) سورة آل عمران

'এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ একটি দল থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে।'[২২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাসির এবং ওলামাদের বিরাট একদল বলেছেন: এ মহান কাজে তোমাদের মধ্য থেকে একটিদল নিয়োজিত থাকা চাই। যারা আলাহর দিকে আহবান করবে, তাঁর দ্বীন প্রচার করবে, তাঁর আদেশ–নিষেধ বান্দাদের নিকট পৌঁছাবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আলাহর দিকে আহবান করেছেন, সাধ্যানুযায়ী মক্কায় আলাহর বিধান বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর সাহাবীরাও একাজে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের সামর্থানুপাতে। হিজরতের পর এর চেয়েও অধিক দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন। নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের ওফাতের পর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং শক্তি–সামর্থ্য, ও যোগ্যতা অনুযায়ী এ দায়িত্ব চালিয়ে গিয়েছেন নিরলসভাবে।

দাওয়াত কর্মীর স্বল্পতা, অন্যায়-অশীলতার বৃদ্ধি, অজ্ঞতার প্রাবল্যের সময় –যেমন আমাদের এ সময়ের কথাই বলা যায়– দাওয়াতের হুকুম হবে ফরযে আইন। এবং প্রত্যেক মুসলিমকেই অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন গ্রাম, শহর বা এ জাতীয় কোন স্থানে বসবাস করে আর সেখানে এ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণকারী কাউকে পাওয়া যায়, এবং সে ব্যক্তি দাওয়াতের মাধ্যমে আলাহর বিধান মানুষের নিকট এমনভাবে প্রচার করেছে যে সেস্থানে বসবাসকারী সকলের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এমতাবস্থায় অন্যদের জন্য এ তাবলীগ সুন্নাত, কারণ অন্যের দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তাকে ছাড়াও আলাহর হুকুম বাস্তবায়ন হয়েছে।

তবে এ দায়িত্ব সকল মানুষ অপেক্ষা আলেম ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রশাসকদের উপর আরোও অধিক আবশ্যিক যাকে বলে ফরযের উপর ফরয।

[২২] সূরা আলে ইমরান:১০৪

এতে বুঝা যায় দাওয়াত ইলালাহ ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া হওয়াটা আপেক্ষিক বিষয়। কারো ক্ষেত্রে এটা ফরযে আইন আবার কারো ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া। তবে শাসক এবং সামার্থবান ব্যক্তির উপর এ ক্ষেত্রে দায়িত্বটা আরো বড়। তাদের উপর অবশ্যই করণীয় হচ্ছে তাদের সাধ্যমত পৃথিবীর সকল প্রান্তে আলাহর রিসালত পৌঁছে দেয়া সম্ভাব্য সকল পন্থায়, মানুষের ব্যবহৃত সকল ভাষায়। এতে করে পৃথিবীর সকলের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় দ্বীন পৌঁছে যাবে। সে লোক আরবী ভাষা ভাষী হোক কিংবা অন্য কোন ভাষা ভাষী। কেননা আমরা কিছু পূর্বেও উলেখ করেছি যে, বর্তমানে আগের তুলনায় দাওয়াতী প্রচারণা খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের উদ্ভাবনের কারণে। এমনিভাবে ওয়ায়েজ, খতিব ও বক্তাদের উপরও অবশ্য কর্তব্য মাহফিল, সমাবেশ জুমআ ইত্যাদিতে সাধ্যমত আলাহর বিধান প্রচার করা।

বর্তমান সময়ে ইসলামী আকীদা বিরোধী নানাবিধ ষড়যন্ত্র, তাদের বিশ্বাসের মৌলিকত্ব বিনাশ, নাস্তিকতার দিকে আহবান, প্রতিপালক, রিসালাত ও পরকালকে অস্বীকার এবং বহুদেশে খৃষ্টধর্মের দিকে দাওয়াতের বহুবিধ কর্মসূচির বিস্তৃতিসহ বহু ভ্রান্ত আহবানের ব্যাপকতার কারণে দাওয়াত ইলালাহ একযুগে সকল মুসলমানের উপর ব্যাপকভাবে ফরয হয়ে পড়েছে। সর্বস্তরের আলেম ও ইসলামে বিশ্বাসী সকল শাসক-প্রশাসকের উপর অবশ্য পালনীয় ফরয হয়ে গিয়েছে যে, তারা নিজ নিজ সাধ্যমত লেখনি, বক্তৃতা, বিবৃতি এবং প্রচারযন্ত্রসহ সকল মাধ্যমে আলাহর দ্বীন প্রচার করবে। এতে গড়িমসি করার সুযোগ নেই, অন্য ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভর করারও অবকাশ নেই। বরং এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আরো অধিক প্রয়োজন। কারণ ইসলামের শত্রুরা এ সকল উপকরণাদির মাধ্যমে লোকদের দ্বীন থেকে দূরে সরানো, দ্বীন বিষয়ে জনমনে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি ও তাদের ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত:মুসলমানদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশে একে অপরকে সাহায্য– সহযোগিতা করে থাকে। সুতরাং তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ইসলাম পন্থীদেরও প্রয়োজন এসব ক্ষেত্রে তৎপর হওয়া এবং শত্রুদের এহেন ভ্রান্ত তৎপরতার মোকাবেলায় সকল ক্ষেত্রে হকের দাওয়াতকে জোরদার করা, দ্বীনের প্রচার–প্রচারণাকে ব্যাপকতা দানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে সকল পর্যায়ে দ্বীনের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্রত সম্পন্ন করা। দাওয়াত কর্মে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে দাওয়াতী কর্মসূচির ব্যাপকতা দান আলাহ কর্তৃক তাঁর বান্দার উপর ফরযকৃত আলাহর দিকে দাওয়াতেরই অংশ।

দ্বিতীয় বিষয়: দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতি

একজন মুসলমানের জন্যে সবচে সুবিধার দিকটি হলো তার সার্বিক জীবনে সফল হওয়ার কুরআন-হাদীস অনুসরণ করাই যথেষ্ট। দাওয়াতের দিকটিও এর বাইরে নয়। দাওয়াতী ময়দানে সফল হতে হলে কি প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে সে প্রকৃতি ও ধরন সর্ম্পকে আলাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলুলাহর হাদীসেও এ বিষয়টি এসেছে প্রকৃষ্টভাবে।

আলাহ তাআলা খুব স্পষ্টকরে বলেছেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١٢٥) سورة النحل

‘তুমি তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দরতম পন্থায়’[২৩]

দাওয়াত পদ্ধতি কি হবে এবং একজন দাওয়াত কর্মীকে কি কি গুণ অর্জন করতে হবে যা সে দাওয়াতি ময়দানে প্রয়োগ করবে উপরোক্ত আয়াতে আলাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সে দাওয়াত শুরু করবে হিকমত ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে। এখানে হিকমত বলতে বুঝানো হয়েছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণসমূহ যা স্বচ্ছ ও সন্তোষজনক পন্থায় হক্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অসার ও বাতুলতাকে খণ্ডন করবে।

কতিপয় মুফাস্সিরের মতে, ‘তুমি তোমার রবের পথে হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে’ একথার অর্থ কুরআনের মাধ্যমে, কারণ কুরআনই হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের হিকমত, এর মধ্যে হক্ব ও সত্য সম্পর্কে খুবই স্বচ্ছতার সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে বলা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, কুরআন-হাদীস বর্ণিত দলিল প্রমাণাদির সাহায্যে।

যাই হোক হিকমত একটি তাৎপর্যময় অতি উচ্চ অর্থবোধক শব্দ যার মর্ম হচ্ছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সত্যস্পষ্টকারী দলিলের মাধ্যমে আলাহর দিকে আহবান করা। এবং এটি সমার্থবোধক একটি শব্দ, নবুওয়ত, দ্বীনের

[২৩] সূরা নাহল, ১২৫।

বুঝ, বোধ-বিবেক, ধার্মিকতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম শাওকানীর বক্তব্য মতে মৌলিকত্বের বিবেচনায় হিকমতের অর্থ হচ্ছে,যে বিষয় মূর্খতা প্রসূত কার্যাদি থেকে বিরত রাখে সেটিই হিকমত। অর্থাৎ যেসব বক্তব্য, লেখনি কিংবা উক্তি আপনাকে নির্বুদ্ধিতা ও বাতুলতা থেকে রক্ষা করবে সেটিই হিকমত।
এমনি ভাবে প্রত্যেক স্পষ্ট কথা যা প্রকৃত অর্থেই শুদ্ধ সেটিই হিকমত। এসব বিবেচনায় কুরআনের আয়াত সর্বোত্তম হিকমত, এর পর সহীহ হাদীস এবং আলাহ উভয়টিকে হিকমত বলে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত'।

আয়াতে বর্ণিত হিকমত অর্থ সুন্নত। অতএব সার কথা হল, সুস্পষ্ট শরয়ী দলিলাদিকে হিকমত বলা হয় এবং যেসব পরিস্কার ও স্পষ্ট কথা হক্ব বুঝতে ও গ্রহণ করতে সহায়তা করে তাও হিকমত।
এ বিবেচনায় ঘোড়ার মুখে স্থাপিত বস্তুকে 'হাকামা' বলা হয়। কারণ ঘোড়ার মালিক 'হাকামা, (লাগাম) টেনে ধরলে ঘোড়া থামতে বাধ্য হয়ে যায়। ঐ হাকামাই তাকে চলা অব্যাহত রাখতে বাধা দেয়। একই ভাবে 'হিকমত' ও এমনই কথা যা শ্রবণকারীকে বাতিলের পথে চলতে বাধা প্রদান করে, হক্ব ও সত্যের প্রতি প্রভাবিত করে তা গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায় এবং আলাহ নির্ধারিত সীমায় অবস্থান নিতে সাহায্য করে।
তাই দায়ী ইলালাহর দায়িত্ব হচ্ছে, আলাহর দিকে আহবানের এ গুরু দায়িত্ব পালনকালে হিকমতের পথ অবলম্বন করা এবং দাওয়াত কর্ম হিকমত দিয়েই শুরু করা, এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। যদি দাওয়াত প্রদত্ত্ব ব্যক্তির মাঝে কোন সংকীর্ণতা বা আপত্তি থাকে তাহলে উত্তম উপদেশের স্মরণাপন্ন হওয়া, উৎসাহ ব্যাঞ্জক পবিত্র আয়াত ও হাদীসের উপদেশ দ্বারা দাওয়াত পেশ করা। যদি কাঙ্খিত ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তাহলে উত্তম পন্থায় বিতর্কের রাস্তা গ্রহণ করা। এবং কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছার নিমিত্তে ধৈর্য ধারণ করা, তাড়াহুড়ো বা বল প্রয়োগ কিংবা রূঢ় আচরণের চিন্তা পরিহার করা। বরং সন্দেহ নিরসনের জন্য আলাহর উপর ভরসা করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অব্যহতভাবে। এবং দলিলাদি উপস্থাপন করবে উত্তম পদ্ধতিতে। মনে রাখবেন দাওয়াতি ময়দানে সফল হতে হলে আপনাকে কষ্ট সহিষ্ণ, ধৈর্যশীল ও প্রসন্ন- কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে কখনই কঠোরতার পথ অবলম্বন করা যাবে না।

হে আলাহর পথের দায়ী! হক্বের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হওয়া, হক্ব গ্রহণ করা এবং হক্বের দাওয়াত দ্বারা পেশকৃত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা ও বিতর্ক–আলোচনায় তাকে সন্তুষ্ট করে হক্ব গ্রহণে তাকে উৎসাহী করার এটিই সহজ উপায়।
আলাহ তাআলা মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে ফিরাউনের কাছে দাওয়াত দানের নিমিত্তে প্রেরণকালে তার সাথে নম্রতা বজায় রেখে কথা বলার নির্দেশ দিলেন অথচ সে ছিল সবচে বড় সীমালঙ্ঘনকারী।
আলাহ বলেন:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤) سورة طه

'তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।'[২৪]

অন্যত্র নবী মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বিষয়ে বললেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (١٥٩) سورة آل عمران

'অতঃপর আলাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত'।[২৫]
বুঝা গেল দাওয়াতের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি এবং সঠিক পন্থা হলো, দায়ীকে প্রজ্ঞাপূর্ণ, দূরদর্শী হয়ে দাওয়াত দানে প্রবৃত্ত হওয়া। তাড়াহুড়ো ও বল প্রয়োগের মানসিকতা ত্যাগ করে হিকমতের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া। কুরআন ও হাদীসের প্রভাবপূর্ণ উপদেশ বাণীর মাধ্যমে দাওয়াত পেশ করা যেগুলো দাওয়াত পেশকৃত ব্যক্তির হৃদয়-মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং হক্ব গ্রহণে প্রেরণা দানে খুবই পারঙ্গম। বিতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানেও উত্তম

[২৪] সূরা ত্বাহা, ৪৪।
[২৫] সূরা আলে ইমরান:১৫৯

আদর্শের স্বাক্ষর রাখতে হবে, যুক্তিপূর্ণ তথ্য পেশ ও নম্রতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নিজ মতাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত করার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সফল হতে হলে এ পদ্ধতির বিকল্প আর কিছু নেই।

কুরআন, হাদীস ও শরয়ী বিষয়ে অজ্ঞতা নিয়ে দাওয়াত প্রদান অনোপকারী বরং ক্ষতিকারক। –এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ একটু পরে দায়ীর আখলাক শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেয়া হবে– কারণ দলিল প্রমাণ বিষয়ে অজ্ঞ থেকে দাওয়াত প্রদান বিনা ইলমে আলাহর উপর কথা বলার নামান্তর। এমনিভাবে কর্কষ ভাষায়, বল প্রয়োগের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের ক্ষতিও অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে সূরা আন নাহল এ আলাহর নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করা অতি জরুরি।

ইরশাদ হচ্ছে,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (١٢٥) سورة النحل

'তুমি তোমার রবের দিকে আহবান কর হিকমতের মাধ্যমে'।[২৬]

তবে যদি দাওয়াত পেশকৃত ব্যক্তি থেকে নির্যাতন, একগুঁয়েমি প্রকাশ পায় তাহলে তার উপর কঠোরতা করাতে বাধা নেই।

আলাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (٩) سورة التحريم

'হে নবী কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হন।[২৭]

তৃতীয় বিষয়: দাওয়াতের বিষয় বস্তু

ওপরের বর্ণনা হতে দাওয়াতের বিধান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেল যে একজন দায়ীকে দাওয়াত কর্ম চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর। এখন জানা প্রয়োজন দাওয়াত কর্মী অপরকে কোন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিবে বা তার দাওয়াতের বিষয়বস্তু কি হবে যা তাকে মানুষদের নিকট ব্যাখ্য–বিশেষনসহ উপস্থাপন করতে হবে যেমনটি করেছিলেন যুগে যুগে নবীগণ। আর সে বিষয়টি হলো "আলাহর সরল পথের দিকে দাওয়াত" অন্যভাবে বললে "ইসলামের দিকে দাওয়াত" এটাই আলাহর সত্য ধর্ম, এবং এটাই দাওয়াত স্থল। যেমন আলাহ বলেছেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ (١٢٥) سورة النحل

'তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহবান কর'

অতএব আলাহর পথ হল ইসলাম, এটাই সিরাতুল মুসতাকিম, এটা ঐ দ্বীন যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন স্বীয় নবী মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে। এদিকেই দাওয়াত দেয়া ফরয। কোন মাযহাব, কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস-মতবাদ নয়, বরং আলাহর দ্বীনের দিকে, সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে, যা দিয়ে আলাহ স্বীয় নবী ও খলিল মুহাম্মদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে প্রেরণ করেছেন। এটাই কুরআনুল কারিম ও রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে প্রমাণিত হাদিস থেকে বুঝা যায়।

সিরাতে মুস্তাকিম তথা ইসলামের প্রতি দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের ক্রমধারা বঝায় রাখা বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বাগ্রে দাওয়াত দিতে হবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি। এর মধ্যে সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে সহিহ আক্বিদাহ, ইখলাস ও ইবাদত-উপাসনায় আলাহর একত্ববাদের প্রতি, আলাহ, তদীয় রাসূল ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি, এবং রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আলাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন আমাদের যা শুনিয়েছেন তার প্রতি এগুলোই সিরাতুল মুস্তাকিমের ভিত্তিমূল। এটিই 'লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ'র প্রতি দাওয়াতের প্রতিভূ। ব্যাপকভাবে এর বিশেষণ করলে অর্থ এই দাড়ায়, ইখলাস ও একত্ববাদের দিকে দাওয়াত। আলাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের দিকে দাওয়াত। এ ব্যাপকতার ভিতর ঐ সকল বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যা সম্পর্কে আলাহ ও তাঁর রাসূল সংবাদ দিয়েছেন। এবং যা ইত:পূর্বে ঘটেছে আর যা কেয়ামতের পূর্বে ও পরকালে ঘটবে, সুতরাং দাওয়াত কর্মীকে ঐসব বিষয়ের প্রতিও দাওয়াত দিতে হবে।

একইভাবে অন্তর্ভূক্ত হবে আলাহ তাআলা কর্তৃক ফরজকৃত বিষয়াবলী যেমন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রোযা পালন করা ও আলাহর পবিত্র ঘরে হজ্জ করার প্রতি দাওয়াত। আরও যুক্ত হয় জিহাদ ফি সাবিলিলাহ, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, পবিত্রতা, লেন-দেন, বিবাহ-তালাক, ভরণ পোষণ, যুদ্ধ–শান্তি অর্থাৎ সকল

[২৬] সূরা নাহল:১২৫

[২৭] সূরা তাহরীম, ০৯।

ব্যাপারে আলাহর বিধান গ্রহণ করার প্রতি দাওয়াত। কারণ আলাহর দ্বীন হচ্ছে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ, ইহকাল ও পরকালে বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন ও কল্যাণকে অন্তর্ভূক্ত করে। আরোও আহবান করবে উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর কাজের দিকে, নিষেধ করবে অসৎ চরিত্র এবং খারাপ কাজ থেকে। দাওয়াত একই সাথে এবাদত (উপাসনা) ও ক্বিয়াদত (নেতৃত্বদান)। একজন দাওয়াত কর্মী একই সাথে আবেদ (উপাসক) ও কায়েদ (নেতা)।

দাওয়াত এবাদত ও বিচার ব্যবস্থা, সুতরাং একজন দায়ী যেভাবে নামায ও রোযা পালনকারী একই সাথে সে আলাহর বিধান মত বিচারক ও আলাহর বিধানকে বাস্তবায়নকারী।

দাওয়াত ইবাদত ও জিহাদ, সে হিসাবে একজন দায়ি আলাহর দিকে আহবান করবে এবং যে আলাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।

দাওয়াত হল– কুরআন ও হাতিয়ার, সুতরাং দায়ি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, শক্তি সাহস দিয়ে তা বাস্তবায়ন করবে আর যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র ব্যবহার করবে। দাওয়াত হল– রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, তাই দায়ি একই সাথে আহবান করবে উন্নত চরিত্র, ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দিকে এবং মুসলমানদের মাঝে হৃদ্যতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি দিবে।

যেমন আলাহ তাআলা বলেছেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (١٠٣) سورة آل عمران

'তোমরা সকলে মিলে আলাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।'[২৮]

সম্মানিত পাঠক! আমরা আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলে দ্বীন ইসলামীর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাব যে, আলাহর দ্বীন ঐক্যের দিকে আহবান করে, প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশুদ্ধ রাজনীতির দিকে আহবান করে, যা পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিল সৃষ্টি করে অমিল ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে। হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ করে দূরত্ব ও ভিন্নতা অপসারন করে। ইসলামী জীবন বিধান আত্মার শুদ্ধিতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। আবেদন জানায় নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার, আলাহ ও বান্দার জন্য কল্যাণ কামনার। এমনি ভাবে আবেদন জানায় আমানত আদায় ও শরয়ী রীতি অনুযায়ী বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনার এবং আলাহ যা অবতীর্ণ করেননি এমন বিচার পরিহারের দিকে।

যেমন আলাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٥٨) سورة النساء

'নিশ্চয়ই আলাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার হকদারের নিকট প্রত্যার্পণ করতে। এবং তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।'[২৯]

এমনিভাবে দাওয়াত হল, রাজনীতি ও অর্থনীতি যেমনি করে এটি রাজনীতি, ইবাদত ও জিহাদ। তাই এটি আহ্বান জানায় সুষম শরয়ি অর্থনীতির দিকে। জুলুম নির্ভর পুজিবাদী অর্থনীতি নয়, যা বৈধতা ও শালীনতার ধার ধারে না, বরং মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেকোন পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমের অর্থনীতিও নয়, যাতে মানুষের সম্পদের প্রতি প্রতি কোন শ্রদ্ধবোধ নেই তাদের উপর জুলুম-নিপীড়ন ও বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা-শঙ্কোচ করে না। ইসলামী অর্থনীতি এর কোনটিই নয় বরং উভয় অর্থ ব্যবস্থার মাঝামাঝি, উভয় পথের মাঝামাঝি, দুইটি বাতিলের মাঝে ভিন্ন একটি হক্ব।

পাশ্চাত্য সমাজ সম্পদকে অনেক বড় করে দেখেছে তাই সম্পদ বৃদ্ধির অভিপায়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল পন্থায় চেষ্টা করেছে এমনকি আলাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ পন্থাও।

প্রাচ্যের সোভিয়েতী নাস্তিক্য সমাজ এবং যারা তাদের মতবাদ অবলম্বন করেছে তারা মানুষের সম্পদের ন্যূনতম মর্যাদা দেয়নি বরং গণমানুষের সম্পদ লুটপাট করে নিজেদের করে নিয়েছে এসব কাজ করতে তাদের বিবেক মোটেও বাধা দেয়নি। তারা জনসাধারণকে দাসে পরিণত করেছে, তাদের উপর নির্যাতন করেছে নির্দয়ভাবে। আলাহর সাথে কুফরী করেছে, আলাহ প্রদত্ত ধর্মসমূহকে অস্বীকার করেছে।

তাদের মতবাদ ছিল, لاإله، والحياة مادة 'কোন ইলাহ নেই, পুঁজিই জীবন'।

[২৮] সূরা আলে ইমরান:১০৩

[২৯] সূরা নিসা:৫৮

সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে তারা নীতি- নৈতিকতা নিয়ে ভাবেনি, অবৈধ উপায়ে আহরণ ও সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং আলাহ প্রদত্ত্ব বোধ-বিচার কেন্দ্রিক বৈধ উপায়ে উপার্জন ও উপভোগের মাঝে কোন প্রার্থক্য তারা করেনি।

ইসলাম জুলুম, প্রতারণা, সুদ ও অনৈতিক পন্থাকে এড়িয়ে অর্থনীতিতে সম্পদ উপার্জন ও সংরক্ষণের একটি বৈধ শরয়ী নীতি প্রবর্তন করে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। যেমনি করে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা, যৌথ মালিকানাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এর স্বীকৃতি দিয়েছে আগেই। সুতরাং ইসলাম উক্ত দু'অর্থ ব্যবস্থার মধ্যবর্তী ব্যবস্থা। দু'অস্পষ্ট পন্থার মধ্যবর্তী পন্থা। ইসলাম সম্পদকে হালাল সাব্যস্ত করে তৎপ্রতি উৎসাহ দিয়েছে। প্রজ্ঞপূর্ণ পদ্ধতিতে উপার্জনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সাথে সাথে আলাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং আরোপিত বিধানাবলির ব্যাপারে উদাসীন হবার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে।

যেমন আলাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢٩) سورة النساء

'হে মু'মিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায় ভাবে পরস্পরের ধন–সম্পত্তি গ্রাস করোনা'[৩০]

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

'প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্ভ্রম পবিত্র'

তিনি আরো বলেছেন:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا.....

'তোমাদের রক্ত, সম্পদ, সম্ভ্রম তোমাদের উপর এ পবিত্র দিন এ পবিত্র মাস এবং এ পবিত্র শহরের মতই পবিত্র '

তিনি আরো বলেছেন:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ حُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَىظَهْرِهِ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ

'তোমাদের কেউ কাঠের একটি আঁটি সংগ্রহ করে নিজের পিঠে চাপিয়ে বিক্রয়ের মাধ্যমে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করা লোকদের নিকট প্রার্থনা অপেক্ষা অতি উত্তম চাই লোকেরা দান করুন বা ফিরিয়ে দিক।'

রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন উপার্জন সবচেয়ে উত্তম, তিনি বললেন: ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন, এবং প্রত্যেক বৈধ বেচা– কেনা।

তিনি আরো বলেছেন: নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদ থেকে আহারের চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ গ্রহণ করেনি। আলাহর নবী দাউদ নিজের উপার্জন থেকে আহার করতেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আমাদের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা মধ্যপন্থী অর্থব্যবস্থা। পাশ্চাত্য পূঁজিবাদও নয় আবার নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমও নয়। যারা জনসম্পদকে নিজেদের সম্পদ জ্ঞান করেছে, সম্পদের প্রকৃত মালিকদের অপদস্ত করেছে, সাধারণ জনগণকে দাসে পরিণত করেছে, এবং আলাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল জ্ঞান করেছে। সম্পদ উপার্জনের অধিকার আপনার রয়েছে তবে শরিয়ত অনুমোদিত পন্থায়ই তা হওয়া উচিত। আপনিই আপনার সম্পদের এবং সে সম্পদ আলাহ প্রদর্শিত শরয়ি ও হালাল পথে উপার্জনের অধিক উপযুক্ত।

ইসলাম তার অনুসারীদের ঈমানী ভ্রাতৃত্ব, পর হিতাকাংখিতা ও অপর মুসলিমকে সম্মান প্রদর্শনের প্রতি আহবান জানায়। এবং হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতাসহ যাবতীয় অসদাচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

আলাহ তাআলা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٧١) سورة التوبة

'আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অপরের বন্ধু,[৩১]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (١٠) سورة الحجرات

'নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই'[৩২]

[৩০] সূরা নিসা, ২৯।
[৩১] সূরা তাওবা, ৭১।
[৩২] সূরা হুজরাত, ১০।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না, তাকে নিরাশ করে না... ।

অতএব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই । একজন মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে অপর মুসলমান ভাইকে সম্মান করা, তুচ্ছ জ্ঞান না করা, তার প্রতি ন্যায়বিচার করা এবং শরিয়ত সম্মত তার সকল অধিকার প্রদান করা । এসব দায়িত্ব পালন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব ।

নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন:

المؤمن مرآة أخيه المؤمن.

'মুমিন তার অপর মুমিন ভাইয়ের দর্পন'

প্রিয় ভাই! আপনি আপনার মুমিন ভাইয়ের আয়না । ঈমানী ভ্রতৃত্বের বন্ধন যে ভীতের উপর প্রতিষ্ঠিত আপনি তার একটি ইট । আপনার ভাইয়ের অধিকারের ব্যাপারে আলাহকে ভয় করুন, তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হোন । তার সাথে হক, কল্যাণ ও সততার সাথে লেন-দেন করুন । আপনার একান্ত কর্তব্য হল ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরা । কিছু অংশ গ্রহণ করলেন আর বাকি অংশ ছেড়ে দিলেন; এমনটি হলে চলবে না । আক্বীদা গ্রহণ করলেন আর আহকাম ও আমল ছেড়ে দিলেন কিংবা আহকাম ও আমল গ্রহণ করলেন আর আক্বিদা ছেড়ে দিলেন এমন যেন না হয় । বরং পুরো ইসলামকে গ্রহণ করুন; আক্বিদা, আমল, ইবাদত, জিহাদ, সামাজিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছু । অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করুন সামগ্রিক ভাবে ।

আলাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) سورة البقرة

'হে মু'মিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।'[৩৩]

সালাফে সালেহীনদের একটি বৃহৎ দল এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন: এর অর্থ হল তোমরা পূর্ণাঙ্গ শান্তি তথা ইসলামের মাঝে প্রবেশ কর ।

ইসলাম কে শান্তি বলা হয়েছে, কারণ এটা নিরাপত্তার পথ, ইহকাল ও পরকালে মুক্তির পথ । সুতরাং এটা শান্তি ও আনুগত্য । ইসলাম মানবতাকে নির্ধারিত দণ্ডবিধি, কেসাস, ও সত্যিকার জিহাদের মাধ্যমে শান্তির দিকে আহবান করে । এবং এরই মাধ্যমে বিরত রাখে রক্তপাত ও হানাহানি হতে । অতএব এটা শান্তি ও আনুগত্য, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস ।

এজন্য আলাহ বলেছেন: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ ইসলামের সকল শাখায় প্রবেশ কর, কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন এমনটি যেন না হয় । বরং তোমাদের কর্তব্য পুরো ইসলামকে আঁকড়ে ধরা । وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ "আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা" অর্থাৎ আলাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ গুনাহ ও অবাধ্যতার রাস্তা গ্রহণ করো না । কারণ শয়তান গুনাহ ও অবাধ্যতার দিকে ডাকে এবং আলাহর দ্বীনকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে । অতএব দেখা যাচ্ছে শয়তান হচ্ছে সবচে' বড় শত্রু, তাই প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরা, তার যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়মিত পালন করে চলা, এবং আলাহর রশিকে শক্ত করে ধরা । একই সাথে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ হতে দূরে থাকা । সুতরাং একজন মুসলমান হিসেবে আপনার করণীয় হচ্ছে, ইবাদাত-বন্দেগি, লেন-দেন, আচার-আচরণ, বিবাহ-তালাক, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন এক কথায় মানবীয় সব কার্যাদি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আলাহর শরিয়ত পরিপূর্ণ রূপে মেনে চলা, শরিয়তের বিধি-বিধান মতে কাজ করা । এমনিভাবে শরিয়ত নির্ধারিত বিধি মেনে চলার ব্যাপারে যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা, শত্রু ও মিত্র মোট কথা সকল ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য ।

আলাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান সব ক্ষেত্রেই কার্যকর করা জরুরি, একজন আপনার মতের সাথে একমত পোষন করেছে তাই তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন আর অন্যজন ভিন্নমত পোষন করায় তার সাথে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করবেন এটি কিন্তু কোনভাবেই ন্যায় সঙ্গত নয় । সুতরাং আপনাকে এসব ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে । লক্ষ্য করে দেখুন নবী সহচরবৃন্দের জীবনাচারের দিকে কত মাসআলাতেই না তারা পরস্পর মতভিন্নতায় উপনীত হতেন অথচ এত কিছুর পরও তাদের মাঝে কি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থেকেছে । মাসআলা ও সিদ্ধান্তগত মতবিরোধের কারণে পারস্পরিক সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়েনি । আলাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আলাহর উপর সন্তুষ্ট ।

[৩৩] সূরা রাকারা, ২০৮ ।

সুতরাং মুমিন তার সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে আলাহর বিধান মত। দ্বীনের হক সিদ্ধান্তের অনুকূলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যুক্তি প্রমাণসহ দ্বীনকে সবার সামনে তুলে ধরবে। তবে দলিল প্রমাণ উহ্য এ ধরণের ইজতেহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষনের কারণে কোনো ক্রমেই যেন অন্য ভাইয়ের প্রতি অন্যায় করতে প্ররোচিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে খুবই সচেতনতার সাথে।

এমনিভাবে ঐ সব মাসআলাতেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেখানে আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কারণ এটা ক্ষমা যোগ্য। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে তার কল্যাণ কামনা করা, তার মঙ্গলের চিন্তা করা। এসমস্ত কারণে আপনাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সে সম্পর্কে সজাগ থাকা। এবং তার সাথে শত্রুতা পোষনকারী ব্যক্তিরা যাতে আপনার কোন মদদ না পায় সে দিকেও খেয়াল রাখা। সাথে সাথে এরূপ কাজ আপনার ভাইও যাতে করতে না পারে সে ব্যাপারেও নিজেকে বিচক্ষণ প্রক্রিয়ার মাঝে ধরে রাখা।

ইসলাম ইনসাফের ধর্ম, হক এবং কল্যাণ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। এতে রয়েছে সর্বপ্রকার মঙ্গলের আহবান, উন্নত চরিত্রের প্রতি আহবান, সুন্দর কাজের প্রতি আহবান, ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রতি আহবান, এবং সকল প্রকার অশীল আচার–আচরণ থেকে দূরে থাকার আহবান।

আলাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . سورة النحل

‘নিশ্চয় আলাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও নিকটাত্মীয়– পরিজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং নিষেধ করেন অশ-ীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনকে, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।’[৩৪]

আরোও ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) سورة الحجرات

‘হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আলাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আলাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।’[৩৫]

সারকথা: ইসলামের দাওয়াত কর্মীর উচিত পরিপূর্ণ ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া, মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য ভেদাভেদ না করা। গোঁড়ামি করে এক মাযহাবকে বাদ দিয়ে অন্য মাযহাবের, কিংবা কোন গোত্রকে বাদ দিয়ে অন্য গোত্রের, অথবা কোন নেতা বা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য নেতা বা ব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব না করা। বরং তার লক্ষ্য হবে হক প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষণ করা, এবং মানুষদেরকে এর উপর অবিচল রাখা যদিও এটা করতে গিয়ে কারো কোন মতামতের বিরোধিতা হয়।

যখন মানুষের মাঝে মতবাদ ও মাযহাবের প্রতি গোঁড়ামির ধারা শুরু হয়েছে, তাদের কেউ কেই এমনও বলে যে, অমুকের মাযহাব অমুকের মাযহাব হতে উত্তম, এতে করে মতবিরোধ ও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে। এক পর্যায়ে অবস্থা এত ভয়াভহ আকার ধারণ করেছে যে, কতিপয় মানুষ ভিন্ন মাযহাবালম্বী ইমামের ইমামতিতে নামায পড়ে না। শাফেয়ি মাযহাবের লোক হানাফি ইমামের পেছনে নামায় পড়ে না অনুরূপভাবে হানাফি লোক মালেকি ও হাম্বলি ইমামের পেছনে। এমনটি উগ্রপন্থী-গোঁড়া লোকদের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এটা একটা বিশাল সমস্যা। বরং শয়তানের অনুসারীদের কাজ।

স্বীকৃত সকল ইমামই হেদায়েতের পথ প্রদর্শক। ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আওযায়ি, ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়াহ প্রমুখ সকলেই হেদায়েতের পথ প্রদর্শক ও হকের দায়ী হিসাবে স্বীকৃত। তারা মানুষদেরকে আলাহর দ্বীনের দিকে আহবান করেছেন, হকের দিকে পথনির্দেশ করেছেন। দাওয়াতের এ গুরু দায়িত্ব সম্পাদন ক্ষেত্রে তারা অনেক জটিল জটিল বিষয়াদির সম্মুখীন হয়েছেন। সমাধান খুঁজতে গিয়ে দলিল প্রমাণ অস্পষ্ট থাকার কারণে পারস্পরিক মতভিন্নতায় পতিত হয়েছেন। এ ইজতেহাদের ক্ষেত্রে তারা হয়তো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ, যার ফলে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন, নয়তো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত

[৩৪] সূরা নাহল: ৯০।
[৩৫] সূরা হুজুরাত:১৩।

মুজতাহিদ যাতে তিনি একগুণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। তাহলে ইসলামের স্বীকৃত ইমামবৃন্দ সকলেই (সঠিক করুক বা ভুল) সাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন।

সুতরাং আপনার উচিত তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা নিজ মনে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, এবং তারা ইসলামের ইমাম, হেদায়েতের দিকে আহবানকারী, ও সত্যান্বেষী মর্মে বিশ্বাস করা। তবে এ শ্রদ্ধবোধ ও বিশ্বাস যেন আপনাকে উগ্রতা, গোঁড়ামী ও অন্ধানুকরণের দিকে নিয়ে না যায় (যে বলবেন অমুকের মাযহাব সর্বাবস্থায় নির্ভুল কিংবা অমুকের মাযহাব সর্বাবস্থায় ভুল) সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এমনটি করা মারাত্মক অন্যায় ও ক্ষতিকর মনোবৃত্তি।

আপনার দায়িত্ব হচ্ছে হক ও সত্য আঁকড়ে ধরা এবং দলিল পাওয়া গেলে হকের অনুসরণ করা এতে কারো বিরোধীতা হলেও। অনুরূপভাবে গোঁড়ামি ও কারো অন্ধানুকরণ না করা। ইমামগণের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে সচেতন থাকবেন স্ব স্থানে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। তবে নিজ দ্বীন সম্পর্কে ততোধিক সতর্ক থাকবেন। তাই হককে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন, যদি আপনার নিকট কেউ হক সম্পর্কে জানতে চায় তবে সঠিক পথনির্দেশ করবেন। আলাহকে ভয় করবেন তাঁর অস্তিত্ব সর্বাবস্থায় মনে অনুভব করবেন। এ বিশ্বাস রাখবেন যে হক একটাই। মুজতাহিদগণ যদি সঠিক করেন তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব আর ভুল করলে একগুণ।

মুজতাহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আহলে সুন্নাতের মুজতাহিদ, যারা দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ঈমান ও হিদায়াতের উপর অবিচল। যেমনটি নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে (গোমরাহীর) অন্ধকার থেকে বের করে (হেদায়াতের)আলোয় নিয়ে আসা। হকের দিকে পথনির্দেশ করা যাতে তারা তা নিজেদের মাঝে ধারণ করতে পারে এবং জাহান্নাম ও আলাহর ক্রোধ হতে বাঁচতে পারে।

অনুরূপভাবে কাফেরদের কে কুফুরীর অমানিশা থেকে বের করে হেদায়াতের নূর, অজ্ঞদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলো, এবং পাপীদেরকে পাপের কৃষ্ণতা থেকে মুক্ত করে আনুগত্যের দ্যুতির দিকে নিয়ে আসা। দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য এটিই।

আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (٢٥٧) سورة البقرة

'যারা ঈমান এনেছে আলাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।'[৩৬]

রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন মানুষদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনার জন্যে। এমনিভাবে হকের দায়ীগণও দাওয়াতী কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, আলাহর বান্দাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় নিয়ে আসার জন্যে, জাহান্নাম ও শয়তানের অনুসরণ এবং প্রবৃত্তি পূজা থেকে উদ্ধার করে আলাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে।

চতুর্থ বিষয়: দায়ীর জন্য আবশ্যকীয় চরিত্র ও গুণাবলির বিবরণ:

দাওয়াতী ময়দানে সফল হবার জন্যে একজন দাওয়াত কর্মীর যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন; আলাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সেসব বিষয়ে নানাভাবে উলেখ করেছেন। তন্মধ্য হতে এখানে কিছু উলেখ করা হলো,

প্রথমত: ইখলাস বা আন্তরিক হওয়া:

একজন দায়ীর জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় হচ্ছে আলাহর জন্য আন্তরিক হওয়া। লোক দেখানো, খ্যাতি লাভ, প্রশংসা কুড়ানোর মনোবৃত্তি তার উদ্দেশ্য হওয়া কাম্য নয়। দায়ী মানুষকে আলহার দিকে আহবান করবে কেবলমাত্র আলাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য।

আলাহ বলেন:

[৩৬] সূরা বাকারা. ২৫৭।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ . سورة يوسف

'তুমি বলঃ এটাই আমার পথ, আলাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি'[৩৭]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ . سورة فصلت

'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আলাহর দিকে মানুষকে আহবান করে ।'[৩৮]

তো দায়ী হিসাবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে দাওয়াত কর্মে আন্তরিক হওয়া । এটাই হচ্ছে বড় চরিত্র, এটাই হচ্ছে বড় গুণ, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যার প্রয়োজন সর্বাধিক । সুতরাং দাওয়াতি কাজে আপনার কামনা হবে আলাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সফলতা ।

দ্বিতীয়তঃ দাওয়াত হতে হবে জ্ঞান ভিত্তিক । যে বিষয়ে আপনি দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে আপনার পূর্ণ বুৎপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় । সে সম্পর্কে আপনার অজানা থাকা চলবে না ।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (١٠٨) سورة يوسف

'তুমি বল: এটাই আমার পথ, আলাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে ।[৩৯]

অতএব জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনিস্বীকার্য । ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরয করা হয়েছে, অজ্ঞতায় থেকে দাওয়াত দেয়া থেকে সাবধান । না জানা বিষয়ে কথা বলা থেকে সাবধান । অজ্ঞ-মূর্খরা বিনাশ করে, গঠন করতে পারে না । নষ্ট করে, সংশোধন করে না । হে আলাহর বান্দা আলাহকে ভয় করুন, আলাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন । একটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা না নিয়ে অপরকে দাওয়াত দিবেন না । আর প্রকৃত জ্ঞানতো সেটিই যা আলাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন । সুতরাং সচেতন ও জ্ঞানবান হওয়া জরুরি ।

একজন শিক্ষার্থী ও দাওয়াত কর্মীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছে তা নিরীক্ষণ করা, বিষয়বস্তু ও দলীলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা । যদি বিষয়বস্তুর সত্যতা সুস্পষ্ট ও বোধগম্য বলে অনুভূত হয় তবেই কেবল দাওয়াত দিবে ।

সে বিষয়টি বাস্তবায়ন ধর্মী হোক কিংবা বর্জনীয় ধর্মী, উভয় ক্ষেত্রেই দাওয়াত দিবে । যেমন বিষয়টি যদি আলাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যধর্মী হয় তাহলে বাস্তবায়ন করার জন্য আহবান করবে, আর যদি আলাহ বা রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় তাহলে পরিত্যাগ করার প্রতি দাওয়াত দিবে ।

তৃতীয়তঃ দাওয়াত কর্মী হিসাবে আপনাকে অতিমাত্রায় সহনশীল ও বিনয়ী মনোভাবাপন্ন হতে হবে । হতে হবে পরমত সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল । যেমনটি ছিলেন রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম । তাড়াহুড়ো, কঠোর নীতি গ্রহণ করা হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কঠিনভাবে । এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেও বেশ কয়েকটি দলিল উপস্থাপন করে বিষয়টির বিশেষনের চেষ্টা করেছি । যেমন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . سورة النحل

'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায় ।'[৪০]

আলাহ তাআলা মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে যখন ফিরাউনের কাছে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন তখন তাদেরকে ফেরাউনের সাথে সাথে নম্রতা বজায় রেখে কথা বলার জন্য আদেশ করলেন, অথচ সে ছিল সবচে' বড় সীমালঙ্ঘনকারী ।

আলাহ বলেন:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى . سورة طه

'তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে ।[৪১]

এ ছাড়াও নবী মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের বিষয়ে বললেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ . سورة آل عمران

'অতঃপর আলাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে । আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত' ।

---

[৩৭] সূরা ইউছুফ, ১০৮ ।
[৩৮] হা–মীম আসসাজদাহ, ৩৩ ।
[৩৯] সূরা ইউসুফ: ১০৮ ।
[৪০] সূরা নাহল, ১২৫ ।
[৪১] সূরা ত্বাহা, ৪৪ ।

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন:

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به و من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خرجه مسلم في الصحيح

'হে আলাহ! যার উপর আমার উম্মতের কোন দায়িত্ব অর্পিত হল, এবং সে তাদের উপর সদয় আচরণ করল তুমি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, আর যার উপর আমার উম্মতের কোন দায়িত্ব অর্পিত হল এবং সে তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করল, তুমি তার প্রতি নির্দয় আচরণ করিও।'[৪২]

তাই আপনাকে একজন দায়ী হিসাবে নবী আদর্শের অনুবর্তিতায় দাওয়াত কর্মে কোমল হতে হবে, সর্বাবস্থায় মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে হবে, কোনভাবেই মানুষের উপর কঠোর হওয়া যাবে না। অশোভন, রূঢ়, ও কষ্টদায়ক আচরণ করে তাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া যাবে না। আপনাকে ধৈর্য্য ও সহনশীল হতে হবে। হতে হবে নেতৃত্বে সাবলীল, কথা ও আচরণে কোমল। এতে আপনার 'মাদউ' অর্থাৎ যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন সে মুসলিম ভাইয়ের অন্তরে প্রভাব পড়বে, আপনার কথা শুনতে চাইবে, আপনার প্রতি নমনীয় হবে, আপনার প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সর্বোপরি আপনার দাওয়াত কবুল করবে। মনে রাখবেন রূঢ়তা অপরকে নিজ হতে বিচ্ছিন্ন করে-দূরে ঠেলে দেয়, কাছে আনে না। হৃদ্যতার পরিবর্তে ঘৃণা সৃষ্টি করে।

দায়ীর জন্য বাঞ্ছনীয় বরং আবশ্যক গুণাবলীর মধ্যে এটিও একটি যে, লোকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিবে নিজের মধ্যে আগে তা বাস্তবায়ন করবে। তাকে সে বিষয়ে 'কুদওয়া' তথা আদর্শ হতে হবে। এমন হওয়া চলবে না, যে অপরকে হকের দাওয়াত দিল, কোন ভাল কাজ করতে বলল আর নিজে তা থেকে দূরে সরে রইল অথবা কোন বিষয়ে নিষেধ করল এরপর নিজে তাতে জড়িয়ে পড়ল। এটা অবশ্যই ক্ষতিকর প্রবনতা।

মূলত: সফল মুমিন ও স্বার্থক দায়ী তারাই, যারা আহ্বানকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল থেকে- নিজেরা আমল করে বরং এক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অগ্রসর থাকে আর নিষেধ কৃত বিষয়াদি হতে নিজেরা দূরে থাকে এবং বর্জনের দিক দিয়ে অন্য সবার থেকে এগিয়ে থাকে।

আলাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) سورة الصف

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা, আলাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।'[৪৩]

আলাহ তাআলা ইয়াহুদীদের ভর্ৎসনা করেছেন যে, তারা মানুষকে কল্যাণের কথা বলে, অথচ নিজেদের ভুলে থাকে:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . سورة البقرة

'তবে কি তোমরা লোকদেরকে সৎকার্যে আদেশ করছো এবং তোমাদের নিজেদের ভুলে যাচ্ছ– অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছো না?'[৪৪]

বিশুদ্ধ সনদে নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম হতে বর্ণিত হয়েছে,

'কেয়ামতের দিন একজন লোককে নিয়ে আসা হবে, এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অত:পর তার পেটের নাড়ীভূড়ী বেরিয়ে আসবে, তাতে সে ঘোরতে থাকবে যেমন গাধা চাক্কি নিয়ে ঘোরে, এরই মাঝে জাহান্নামিরা একত্র হবে এবং তাকে বলবে; হে অমুক তোমার কি হয়েছে? তুমি কি আমাদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে হ্যাঁ, আমি তোমাদের সৎকাজের কথা বলতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না, অসৎ কাজে নিষেধ করতাম এবং নিজে করতাম।'

এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে মানুষকে ভাল কাজের দিকে আহবান করে ও খারাপ কাজে নিষেধ করে। অত:পর তার কথা কাজের এবং কাজ কথার বিপরীত হয়। আলাহর কাছে এ অবস্থা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

সুতরাং সকলের নিকট স্পষ্ট হল যে একজন দায়ীর জন্য যে সব গুণাগুণ থাকবে হবে তার মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মানুষকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিবে তা আগে নিজে আমল করা, এবং যা নিষেধ করবে তা থেকে সর্বাগ্রে নিজে বিরত থাকা।

[৪২] মুসলিম।
[৪৩] সূরা সাফফ:২-৩।
[৪৪] সূরা বাকারা:৪৪।

তাকে প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী, ধৈর্যশীল, বিপদে অবিচল, ও দাওয়াত কর্মে আন্তরিক হতে হবে। যে সব কাজ করলে মানুষের কল্যাণ হয়, হক তাদের নিকট দ্রুত পৌঁছে যায়, এবং বাতিল দূর হয় সেসব কাজের জন্য চেষ্টা করা। উপরোক্ত তাদের হিদায়েতের জন্য দোআ করা। এ সবই হচ্ছে একজন আদর্শ দায়ীর আখলাকের অংশ।

দাওয়াত কর্মীকে আরোও একটি বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। আর তা হচেছ, দাওয়াত পেশকৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করা।

বলবে:

هَدَاكَ اللهُ 'আলাহ তোমাকে হিদায়েত দিন' وَفَّقَكَ اللهُ لِقُبُوْلِ الحَقِّ. 'আলাহ তোমাকে হক গ্রহণের তাওফিক দিন।' أعَانَكَ اللهُ على قُبُوْلِ الْحَقِّ আলাহ তোমাকে হক গ্রহণে অনুগ্রহ করুন।

তাকে দাওয়াত দিবেন, দিক-নির্দেশনা দিবেন, সে কোন কষ্ট দিলে সহ্য করবেন, এবং তার জন্য হিদায়েতের দোআ করবেন।

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে যখন 'দাউস' গোত্র সম্পর্কে বলা হল, যে তারা দ্বীন অমান্য করেছে, তিনি বললেন:

اللهم اهدِ دوساً وائت بهم.

'হে আলাহ, দাউসদেরকে হিদায়াত দাও, এবং তাদের দ্বীনের পথে নিয়ে আস'

পকৃত দাওয়াতকর্মীকে কখনও নিরাশ ও হতাশ হওয়া চলবে না। দাওয়াত প্রদত্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সব সময় ভাল বলবে, কোন খারাপ মন্তব্য করবে না। যাতে তারা সত্য থেকে দূরে সরে না যায়। তবে হ্যাঁ কেউ জুলুম বা সীমা লঙ্ঘন করলে ভিন্ন কথা।

আলাহ বলেন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (٤٦) سورة العنكبوت

'তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী....'[৪৫]

তবে, অত্যাচারী ব্যক্তি যে বিদ্বেষ, কষ্ট, ও অনাচারের মাধ্যমে দাওয়াতকে প্রতিহত করতে চায় তার বিধান ব্যতিক্রম। তাকে এর জন্য গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। আর এ শাস্তি অত্যাচার বা অন্যায়ের আনুপাতিক হারে হবে। এবং শাস্তি চলতে থাকবে যতদিন না সে এ গর্হিত কাজ হতে ফিরে আসে।

সম্মানিত দায়ী! এ মহান কাজে সকল কিছুর ঊর্ধে উঠে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কাজকে চলমান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আলাহর নিকট সাওয়াবের আশা করুন, যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবেন তাদের সাথে বিতর্ক করার প্রয়োজন হলে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। তাদের পক্ষহতে অপ্রীতিকর কিছু হয়ে গেলে ক্ষমা করে দিন। স্মরণ রাখবেন আলাহর রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারীগণ আরোও কষ্ট করেছেন আরোও ধৈর্য ধারণ করেছেন।

আলাহর কাছে প্রার্থনা, হে আলাহ আমাদের সকলকে আপনার রাস্তায় উত্তম ভাবে দাওয়াত দেয়ার তাওফিক দিন। আমাদের ভিতর ও বাহির সংশোধন করে দিন। আমাদের সকলকে দ্বীনের বিশুদ্ধ বুঝ দান করুন। দ্বীনের উপর অবিচল থাকা সহজ করে দিন। আমাদেরকে হিদায়েতপ্রাপ্ত ও হিদায়েতের পথপ্রদর্শক- নেককাজ কারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি বড় দয়ালু, মহান দাতা।

সালাত ও সালাম আলাহর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম, তাঁর সাহাবাবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর।

সামপ্ত

[৪৫] সূরা আনকাকুত, ৪৬।